Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 249 – 258
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

আমার মুখের ওপর ফুটন্ত ইতিহাস, অতীত পুরুষের ছায়াযাত্রা : দেবদাস আচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা

স্বরজিৎ মিশ্র
এম.ফিল, বাংলা বিভাগ
গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : misraswarajit555@gmail.com

Keyword

Abstract

সত্তরের দশকের এক উল্লেখযোগ্য কবি দেবদাস আচার্য। বাংলা কবিতার ধারায় সত্তরের দশক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে দাঁড়িয়ে যাঁরা কবিতা চর্চা করেছেন তাঁদের অধিকাংশেরই জন্ম চল্লিশের দশকে। স্বাভাবিকভাবেই কবিদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে অগাস্ট আন্দোলন, নৌ বিদ্রোহ, দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তরের আঁচ আজ তাঁরা টের পেয়েছেন। কবি দেবদাস আচার্যের জন্ম ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিতে। তিনি দেখেছেন উদ্বাস্তু জীবনের বিপন্নতা, দেখেছেন মন্বন্তর, খাদ্য আন্দোলন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলন। এভাবেই তাঁর মননক্ষেত্রটাই নির্মাণ হয়েছিল বিপ্লব আর আন্দোলনের সদা অস্থির আর সঙ্কটময় প্রেক্ষাপটে। একদিকে রাজনৈতিক উত্তাল সময় অন্যদিকে খাদ্য বাসস্থান আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে লড়াই তার কবিতার মনন ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। তার প্রথমদিকের কাব্যগ্রন্থে আমরা যেমন নকশালবাড়ি আন্দোলন, মন্বন্তর, খাদ্য আন্দোলনের কথা খুঁজে পায়, একইভাবে ব্যক্তি জীবনের অভাব, অনটন ও টানাপড়েনকে অপূর্ব বেদনা মধুর করে তুলে ধরেছেন তিনি। তার কবিতা যেমন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমাজ জীবনের নানা বিষয়ের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, আবার একইসঙ্গে লোকায়ত জীবনের ছবিও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। কবি দেবদাস আচার্য নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে কাব্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে নিভৃতে একজন সাধকের মত জীবন যাপন করে চলেছেন তিনি। তাঁর কাব্যগুলিতে দেশ কাল সমাজের ছবি উঠে এসেছে। সত্তরের স্লোগান গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার প্রণেতা যেমন সত্তরের কবি নির্মল হালদার, বীতশোক ভট্টাচার্য, মনীন্দ্র গুপ্ত একই পথের কান্ডারী দেবদাস আচার্যও।

তাঁর কালক্রমে রাজনীতিচেতনা, বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, শ্রেণীসংগ্রাম, ধনতন্ত্র ইত্যাদি প্রবলভাবে ভাষা পেয়েছে। এক দিকে উত্তাল সত্তর দশকের ঘটনাপুঞ্জের বহিঃপ্রকাশ অন্যদিকে স্মৃতিময় শৈশবের ডুব দিয়ে জীবনের সহজ সরল রূপ তিনি খুঁজে গেছেন। তাই 'আমার কালক্রম ও প্রতিধ্বনি', 'ঝড়ঃ সত্তর দশক' এই কবিতাগুলির পাশাপাশি তিনি লেখেন 'সে নিড়িনি চালায় শস্যে', 'আমার জলের পোকা' কবিতাগুলি। দেশকালের প্রতি তাঁর দ্বিবিধ দৃষ্টিক্ষেপ এই সময় সূচিত হল –

"চৈত্রের গাজনে আমি লেংটি পরা শিব সাজলাম
বোলান যাত্রায় আমি হলাম রামভক্ত সুগ্রীব...
এদিকে চৈত্রের মাঠ চেটে খায় ঝুলন্ত সূর্যের জিভ
এদিকে আজানধ্বনি ভেসে আসে বুক বরাবর
আমিও পোশাক খুলে নেমে যাই এইসব পরিপূর্নতায়...
বাথানে ছাগল ভেড়া ফিরে আসে, রাখাল উড়ায় গামছা
গোরু মহিষের পায়ে ভেঙে ভেঙে ধুলো হয় সন্ধ্যা নেমে আসে।
খাড়াই তালের বনে লটকে থাকে সীমান্তের শেষ কারুকাজ"

(আমার জলের পোকা/কালক্রম ও প্রতিধ্বনি)

আজ যা মনের অচেতন স্তরে ডুবে থাকা ছবি সেইসব নিয়েই তার ওপারের শৈশবজীবন 'সীমান্তের শেষ কারুকাজ'। এই সব পরিপূর্ণতার মধ্যে থেকে যায় কবিতার আদি ভিত্তিভূমি। তাঁর কবিতায় আবহমান ভারতীয় গ্রামের ছবি একই সঙ্গে তার শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্য ও মাটির গন্ধ উঠে আসে।

Discussion

কবিতা তাঁর কাছে অস্থিমজ্জার এক আরোগ্যহীন রোগ, যাঁর শিকড় বটবৃক্ষের মতো প্রবেশ করেছে জীবনের ঘাটে। কবিতা তাঁর সমস্ত বক্ষপঞ্জরে, রক্তের স্পন্দনে, স্বপ্নে-ঘুমে, সুখ-অসুখে সর্বময় ছায়াসঙ্গী। কবিতা তাঁর কাছে দিনরাত্রির আনন্দ দোতারার সুর। তিনি সত্তরের দশকের বিশিষ্ট কবি দেবদাস আচার্য। পিতা দয়াময় আচার্য ও মা আশালতা আচার্যের হাত ধরে বাংলাদেশ ছেড়ে ১৯৪৮ এ উদ্বাস্তু অবস্থায় বালক দেবদাস আশ্রয় নেন অধুনা নদীয়া জেলার রানাঘাটে; তারপর বীরনগরে কিছুদিন কাটানোর পর স্থায়ী ঠিকানা হয় কৃষ্ণনগর। কলকাতা নগরী থেকে শত কিমি দূরে এই কৃষ্ণনগরে দীর্ঘ চার দশক নিরলস সাধনায় কবি জীবন অতিবাহিত করেছেন দেবদাস আচার্য। 'সঞ্চয়িতা' পাঠের মধ্য দিয়ে এবং স্কুল পত্রিকায় কবিতা লিখে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত তাঁর কবিতা চর্চার রূপরেখা গ্রন্থবদ্ধ করেন নদীয়া থেকে 'আদম' প্রকাশনা। যার মধ্যে রয়েছে 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি', 'মৃৎশকট', 'মানুষের মূর্তি', 'ঠুঁটো জগন্নাথ', 'উৎসবীজ', 'আচার্যের ভদ্রাসন', 'তর্পণ' সহ অজস্র অগ্রন্থিত কবিতা।

সত্তরের কবিতার মূল সুরটি অনেকটাই বেঁধে দিয়েছিলেন কবি দেবদাস আচার্য। কবি গৌতম বসু লিখেছেন "আজকের গ্রামবাংলার এক মফস্বল শহরের একজন নবীন কবি অবগত নন যে তাঁর কবিতা পড়া ও লেখার নেপথ্যে দেবদাস আচার্যের ভূমিকা কত ব্যাপক ও কত গভীর।"[1] কবি দেবদাস আচার্যের জন্ম ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিতে। তিনি দেখেছেন উদ্বাস্তু জীবনের বিপন্নতা, দেখেছেন মন্বন্তর, খাদ্য আন্দোলন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলন। এভাবেই তাঁর মননক্ষেত্রটাই নির্মাণ হয়েছিল বিপ্লব আর আন্দোলনের সদা অস্থির আর সঙ্কটময় প্রেক্ষাপটে—

"আমি জেনেছি এই বিশ্বের পারদ উষ্ণ হচ্ছে
আমার মনে হয় অক্ষ ও দ্রাঘিমা জুড়ে মৃদু ভূকম্পন একদিন লাভা হবে।"[2]

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত লেখা কবিতা একত্র করে তাঁর প্রথম বই 'কালক্রম ও তার প্রতিধ্বনি' বেরোয়। বইয়ের নামকরণের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বোঝা যায় একটি সময় ও তার প্রতিধ্বনি কবিকে কিভাবে অন্তর থেকে দোলায়িত করেছে। মূল বইয়ে কবিতা সংখ্যা ৩০ হলেও শ্রেষ্ঠ কবিতায় ৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। দীর্ঘায়ত গদ্য পঙক্তিমালায় গাঁথা কবিতাগুলিতে দেবদাসের দৃঢ় স্বরভঙ্গী স্পষ্ট —

"দু পাশে সাদা দেওয়াল মাঝখানে পৃথিবীর অসুখ বাড়ছে
দু পাশের খড়গ আস্তে আস্তে নেমে আসছে সময়ের ওপর
যা আমি বুঝেছি
যে সব উচ্চারণ আমাকে করতে হয়

ঘুম ও পতনের সন্ধিক্ষণে মুখোমুখি সংগ্রাম
ঘুম ও জীবনের মধ্যে রয়েছে আরও এক পরিশ্রম
এবং আমিও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠি সমসাময়িকতায়
আমার কালক্রম ও প্রতিধ্বনিসহ ...”[৩]

(আমার কালক্রম ও প্রতিধ্বনি / কালক্রম ও প্রতিধ্বনি)

সেই কালক্রমে রাজনীতি চেতনা, বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, শ্রেণীসংগ্রাম, ধনতন্ত্র ইত্যাদি প্রবল ভাবে ভাষা পেয়েছে। তাছারা সময়টা ছিল নকশাল আন্দোলনের—

“তখন গামবুট পায়ে বিপ্লবী গেরিলার মতো মেঘ নেমে আসে
পৃথিবীর খুব কাছে, প্রায় প্রতিটি ঘরের দরজায় ...
তখন ঝাউবন টপকে সমুদ্র শহরে ঢুকে যায়
তখন টুপটাপ ঝুলে পড়ে আদিম ব্রিজ ও মহান বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্বের কবিকুল ও সংসদীয় বুদ্ধিজিবীরা বয়া ধরে টালমাটাল ...
তখন শব্দ রেলগাড়ির মতো হুস হুস ছুটে আসে
খিড়কি ও ম্যানহোল টপকে বামবাম বামবাম
হোলাল্লা হুম্বাল্লা
এক লড়াই শুরু হয় থইথই
তাই পৃথিবীর মুখ রাখো হে মুখ রাখো হে
সেই লোকটিও ছুটে যায় ভাঁড়ারে আমার বাঘনখ
আমার বাঘনখ”[৪]

(ঝড়ঃ সত্তর দশকে / কালক্রম ও প্রতিধ্বনি)

সেই টালমাটালে ‘কবিতায় দরজায় উপাসনা কিংবা কোন পিদিম ও তুলসীমঞ্চ সরল সুঠাম প্রাণালী নেই, নেই শস্যে উপচে পড়া গোলা, খেতে খেতে নেই মোহন হাতছানি। তখন পরিপাটি দিন ও ভাতের হাঁড়ি শিকেয় উঠেছে, শিয়রে লটকানো ইস্তাহার’। কবিও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেন সমসাময়িকতায়– ‘এবং আমিও হা হা করে বলি/একটা দামামা দাও একটি দামামা’ কারণ কবির লড়াই শুধু আলুথালু শব্দের হুকুম নয়। কবির তাই দাবি—

“আমি জানি ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে শিল্পকেও সাজতে হবে বর্মে...
কবিতাও সেইসব গল্প বলবে যেমন হো খুড়ো শিশুদের বলতেন
হো খুড়ো শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন মরমী আপেল ও টমিগান
কবিতা শিশুদের পায়ে বেঁধে দেবে ঘুঙুর এবং কাঁধে তুলে দেবে জয়ঢাক
আমি চোয়াল চেতিয়ে সেই রকম কবিতার জন্যই বাঁচতে চাই।”[৫]

(প্রার্থনা/ কালক্রম ও প্রতিধ্বনি)

একদিকে উত্তাল সত্তর দশকের ঘটনাপুঞ্জের বহিঃপ্রকাশ অন্যদিকে স্মৃতিময় শৈশবের ডুব দিয়ে জীবনের সহজ সরল রূপ তিনি খুঁজে গেছেন। তাই ‘আমার কালক্রম ও প্রতিধ্বনি’, ‘ঝড়ঃ সত্তর দশক’ এই কবিতাগুলির পাশাপাশি তিনি লেখেন ‘সে নিড়িনি চালায় শস্যে’, ‘আমার জলের পোকা’ কবিতাগুলি। দেশকালের প্রতি তাঁর দ্বিবিধ দৃষ্টিক্ষেপ এই সময় সূচিত হল—

“চৈত্রের গাজনে আমি লেংটি পরা শিব সাজলাম
বোলান যাত্রায় আমি হলাম রামভক্ত সুগ্রীব...
এদিকে চৈত্রের মাঠ চেটে খায় ঝুলন্ত সূর্যের জিভ
এদিকে আজানধ্বনি ভেসে আসে বুক বরাবর
আমিও পোশাক খুলে নেমে যাই এইসব পরিপূর্ণতায়....
বাথানে ছাগল ভেড়া ফিরে আসে, রাখাল উড়ায় গামছা
গোরু মহিষের পায়ে ভেঙে ভেঙে ধুলো হয় সন্ধ্যা নেমে আসে।

খাড়াই তালের বনে লটকে থাকে সীমান্তের শেষ কারুকাজ।"[৬]

(আমার জলের পোকা/কালক্রম ও প্রতিধ্বনি)

আজ যা মনের অচেতন স্তরে ডুবে থাকা ছবি সেইসব নিয়েই তার ওপারের শৈশবজীবন 'সীমান্তের শেষ কারুকাজ'। এইসব পরিপূর্ণতার মধ্যে থেকে যায় কবিতার আদি ভিত্তিভূমি।

দেবদাস আচার্যের দ্বিতীয় বই 'মৃৎশকট' (রচনাকাল ১৯৭২-১৯৭৪, প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৭৫)। এটি একটি দীর্ঘ কবিতার বই। মোট শ্লোক সংখ্যা ৯২ এবং শুরুতে তিনটি বন্দনা স্তবক রয়েছে। মন্ত্রের মতো সংহত, বর্তুল জ্যোতিষ্ক বুদবুদের মতো এই কবিতাগুলি যেন আকার নিয়েছিল চেতনার আকাশে। যেমন কবিতাটির শুরুতে তিনটি প্রণাম মন্ত্র—

ক। 'প্রণাম করি এই শূন্য রাত্রিকে বন্দনা করি দিবালোক ...'

খ। 'প্রণাম করি শষ্যবিদ্ধ মাটি আর পাহাড় জলরেখা বহমান...'

গ। 'প্রণাম করি আলম্ব ইতিহাস, যুদ্ধ, জরায়ু ও উন্মেষ...'

৪ সংখ্যক শ্লোকে আবহমান ভারতীয় গ্রামের ছবি একইসঙ্গে তার শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্য ও মাটির গন্ধ নিয়ে উঠে আসে দেবদাসের আন্তরিক সংবেদী বর্ণনায়—

"রবিখন্দের খামার পাহাড়া দিচ্ছে জোতদার চাবুক হাতে; এই ভারতীয় গ্রাম,
সামনে গমের খেত, ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানের মতো নোনতা বাতাস বয়ে যায়
একটা গোরুর গাড়ির চাকার শব্দ, ধীরলয় গতি, অতীত ও অনাগত... [৮]

৫, ৬, ৭ সংখ্যক কবিতাগুলিতে খন্ডিত, বিক্ষত জীবনযাপন এবং তারই সঙ্গে নির্বিকার ক্রোধ প্রতিবাদহীন যান্ত্রিক প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। ১১ সংখ্যক কবিতায় দেবদাস যখন বলেন— 'এই মাটিই মানুষের আশ্রয়স্থল; না আকাশ, না পাতাল / এই ঘোর কালো মাটি; একে মুচড়েই মানুষ শিল্পের মধ্যে যায় জীবনের মধ্যে যায়...' তখন এক লহমায় দেবদাসের কাব্যশিল্পের জোরটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ২৩ সংখ্যক শ্লোকটিতে দেবদাস জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য সারল্য ও শুদ্ধতা বিসর্জন দিয়ে আত্মপ্রতারনায় অভ্যস্ত হতে বলেছেন। ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে সংসার নামক যাত্রার কেন্দ্রে, শিকড়ে, বীজে, জীবনপ্রবাহের নিয়ত ক্ষোভ ও তৃষ্ণায় সংগ্রামের কথা বলেছেন। ৪৪ সংখ্যক কবিতায় মাটি, আকাশ, সূর্যে, পাহাড়, সমুদ্রের, শস্যমুখর খামারের, ইঞ্জিন আর জাহাজের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। ৪৬, ৫৬, ৬০ সংখ্যক শ্লোকে সৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে প্রগাঢ় জীবনদর্শনের কথা উঠে এসেছে। ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী জীবনে কেবল চাওয়া পাওয়ার বাসনার বিষয়ে দার্শনিক প্রজ্ঞা ৮২, ৮৩ সংখ্যক কবিতার মূল সুর। যেমন ৮৯ কবিতায় 'আর সবই তাৎক্ষণিক সংকেত' কিম্বা ৯২ শ্লোকে যখন বলেন এ তার দুঃখ নয়, এ তার শোক নয়, এ তার ভালবাসা নয় / সে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল সময়ের...' বস্তুত এই কাব্যের দীর্ঘ আখ্যানজুড়ে গ্রাম, শহর, নিম্নবিত্ত সমাজ, আখন্ড চরাচরের প্রাণ-বস্তু-ভাষা-মন-ব্যক্তি সকলেই নিরন্তর সংগ্রামশীল। মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'দ্রাক্ষাপুঞ্জ, শুড়ি ও মাতাল' গ্রন্থে এই কাব্যের 'মৃৎশকট' নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "দেবদাস হয়তো বলতে চেয়েছেন— গাড়িটি মাটির তৈরি, যেন খেলনা, অকেজো, অতি প্রাচীন, তবু তার চাকাগুলি চলমানতা ও ঘূর্ণণের কথা মনে পড়ায়। গাড়িটি মাটির বলে তাঁর যাত্রাপথ অনন্ত ইতিহাসে, মহাসময়ের মধ্যে— সাড়ে চারশো কোটি বৎসরের জীবাশ্ম এই পৃথিবী" এবং কবি নিজেও তারই অংশ।

তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুষের মূর্তি' (প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭৮) বইটি তিনটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত : গল্প, নিউরোন গুচ্ছ, রোজনামচা। প্রথম বিভাগ 'গল্প' এ ১৬ টি কবিতা, 'নিউরোন গুচ্ছ' অংশে ১২ টি 'রোজনামচা' তে ২৩ টি কবিতা রেখেছেন তিনি। মোট কবিতা সংখ্যা ৫১। দেবদাস বইটির পিছনে লিখেছেন 'জীবন আমাকে যা দিয়ে থাকে আমি তাই কেবল জীবনকে ফিরিয়ে দিতে পারি। এর বেশি শিল্প আমি পারি না, এর বেশি অঙ্গীকার আমি করিনি।' ভিতরে বাহিরে সৎ এবং সচেতন দেবদাসের নিজের কবিতার আদর্শ, অনিষ্ট ও সীমানা সম্পর্কে এই ঋজু ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতএব তাঁর কবিতা আস্বাদ করতে গেলে তাঁর জীবনকেই অনুসরণ করতে হবে। 'দেবদাসের জীবন প্রভাত' বলে অবভাস থেকে প্রকাশিত তাঁর চমৎকার আত্মকথা আছে। আত্মজীবনের সঙ্গে 'মানুষের মূর্তি'র 'গল্প' সিরিজের কবিতাগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন—

১) "আমার মা ঐ কাঠকুটো কুড়িয়ে জড়ো করেন উনুনের ধারে
তাঁর হাতের শাঁখা চুড়ির শব্দ হয় টুনটান
আমার বাবা দাড়িতে হাত বুলোন আর
গুনগুন করে যাত্রা বইয়ের সংলাপ বলেন, আর
সমস্ত দিন ধরে একটানা মন্ত্রোচ্চারণের মতো
তিনি তাঁর সেলাইকল চালান
আমরা ভাইবোনেরা তাঁদের ঘিরে ঘিরে
একটু একটু করে বড়ো হতে থাকি প্রতিদিন,
একটু একটু করে।" (প্রতিদিন / মানুষের মূর্তি)[৯]
২) "আমার বাবা সেলাইকল চালান
এবং তাঁর ঘাম দিয়ে ভিজিয়ে দেন আমাদের রুটি
সেই রুটি খেয়ে আমার এত স্পর্ধা
যা সব কুলিকামিনদেরই থাকে" (স্পর্ধা / মানুষের মূর্তি)[১০]

'খিদে', 'স্পর্ধা', 'বাবা', 'ঘর', 'বটগাছ', 'প্রতিদিন', 'প্রতীক্ষা' এই কবিতাগুলিকে একে অপরের পরিপূরক কবিতা। বাবা নামক বটবৃক্ষের তলে কিভাবে একটা পরিবার বেড়ে উঠেছিল তাঁরই নিখুঁত ও আনন্দময় উচ্চারণ এই কবিতাগুলি। 'দেবদাসের জীবনপ্রভাত' গ্রন্থের ৩৪ নম্বর পৃষ্ঠায় এর ইঙ্গিত আছে—

"বাজারে এক কাপড়ের দোকানের বারান্দায় তিনি তাঁর সেলাইকল পেতে বসে গেলেন। বাবা প্রতিদিন দু টাকা আড়াই টাকার মত রোজগার করতেন। ঐ দুই টাকা আড়াই টাকাতেই আমাদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন জুটে যেত।"[১১]

৩) "ঐ ন্যুব্জ বৃদ্ধা, আমার বুড়িমা, লাঠি ঠুকে ঠুকে হেঁটে যান
কাঁধের ঝুলিতে দোলে জড়িবুটি কন্টিকারী রসের বোতল,
মুখে তার মাঙ্গলিক ঝাড়ফুঁক
শিমুলের লাল ফুটে আছে, কাঁটা ঝোপঝাড় ঘেরা পথ
দূরে গ্রাম, ছেঁড়া ছেঁড়া, ছায়া-ছায়া
তিনি দ্রুত হেঁটে যান।
'আমি ধন্বন্তরি বুড়ি, ঐ লোকালয়কে বাঁচাতে চলেছি'"[১২]
(চিরায়ত / মানুষের মূর্তি)

এর সঙ্গে 'দেবদাসের জীবনপ্রভাত' এর **১১** নং পৃষ্টায় ওই বর্ণনার মিল আছে—

"চোখ বন্ধ করে আজও আমি দেখতে পাই, সোজা থেকে যাওয়া এক বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে, কন্টিকারীর বাড়ির কৌটো, সলসার শিশি, আরো কত কিছু কাঁধের ঝুলিতে নিয়ে হাঁটছেন।"[১৩]

প্রত্যক্ষ বাস্তবের বর্ণনাই কেমন আশ্চর্য জাদুবলে এখানে বিশালতাব্যঞ্জক এক সমুন্নত চিত্রকল্পে মিশে যায়। এছাড়াও 'ছুতোর কাকা', 'বাবা', 'ঘর', 'গহনের বাপজান', 'গল্প'— এসব কবিতায় দরিদ্রের ঘর-গেরস্থালির তুচ্ছতা আর কঠোর জীবনসংগ্রামের বৃত্তান্তই গভীর সংবেদনার স্পর্শে এক স্বতন্ত্র গৌরব পেয়েছে। বস্তুত 'গল্প' অংশের কবিতাগুলি পড়ে মনে হয় আমাদের হাতে এক অ্যালবাম এসে পৌঁছল, যার ওপরটাই কোন জৌলুস নেই, খুবই সাধারণ কিন্তু ভেতরের ফুটোগুলো প্রবেশ করতে করতে চমকে উঠতে হয়, কতটা রক্ত শ্রম ও ভালবাসার দিয়ে ঐ সংসার গড়া।

'মানুষের মূর্তি' বইটিতে একটি ভাগ 'নিউরোনগুচ্ছ'। মনে হয় এই বিরল জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল একটু অন্য হাওয়া। এই অংশের কবিতাগুলিতে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নেই, আছে সুমধুর স্মৃতি এবং তার বিলীন হয়ে যাওয়ার বেদনা—

"প্রতিকারহীনভাবে আমি আমার খানিকটা নিয়ে আছি ...
ওপরে প্রশান্ত নীল, নিচে

মানুষের মিশ্র ধ্বনিময় অবিরাম চলা,
এরই মধ্যে তোমার স্মৃতির সঙ্গে অল্প কথা বলি
হেঁটে যাই, অল্প কথা বলি, হেঁটে যাই"[১৪]

(হেঁটে যাই / মানুষের মূর্তি)

ঘষে ঘষে তুলে ফেলার যোগ্য 'এই সামান্য গল্প' হৃদয়ের সংঘর্ষে এসে কত অসামান্য আর চিরধ্যানের বস্তু হয়ে উঠেছিল সেদিন।

"...এই তো সামান্য গল্প
এই গল্পই আমাকে সারাজীবন বলে যেতে হবে...
এই গল্পই চালিয়ে দেব। কোনো গম্ভীর পুকুর দেখলে নাম দেব স্বপ্নের পুকুর
কোনো বাউলের শাগরেদ হয়ে জনপদে এই গল্পই গেয়ে বেড়াব
গাইতে গাইতে দু কষি বেয়ে ঝরবে আঠা, পোড়াকাঠ হয়ে যাবে শরীর।"[১৫]

(উৎস / মানুষের মূর্তি)

এই কবিতা শুনে বোঝা যায় দেবদাসের গলায় যেন চিরদিনের লোককবি গান গাইছে—সমকালের বিরহ উজান গেয়ে চলেছে মধ্যযুগের বাংলাদেশে। 'উপকথা' কবিতায় ঐ নির্দিষ্ট দেশ কাল গ্রাম নগরের সীমানা পেরিয়ে ক্রমশ দেশের লোককথায় গিয়ে ঢোকে।

"আর ঐ গ্রামের দিকে বাজে খোল
আর ঐ বাঁওড় ঘিরে উপকথা
আর ঐ ছাতিম গাছের নিচে লৌকিক টোটেম
এরই মধ্যে তোমাকে নিয়ে জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে
গ্রাম্য পদ্যকার লিখেছেন পদাবলী
গ্রাম্য মহিলারা ধান ভানছেন আর
করুন আর গ্রাম্য সুরে গাইছেন
সেই নগরবিবির কেচ্ছা।"[১৬]

(উপকথা / মানুষের মূর্তি)

সমস্ত লেখাটির মধ্যে একটা সজল কৌতুক এবং কৌতুকের আড়ালে নিরব ভৎর্সনা ফুটে উঠেছে। 'রোজনামচা' সিরিজের কবিতাগুলিতে মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের অর্থহীনতা, একঘেয়েমি, চাপা উত্তেজনা, ভয়, ক্লীবতা ও শূন্যতা ভাষা পায়। এই অংশে কবির দুই সত্তা ভীষণভাবে স্পষ্ট। এক ভাগে সে দায়বদ্ধ, সামাজিক, অন্যভাগে সে নিজস্ব জীবনের ভিখারি, কবি। যেমন—

"...আমার কিছু বলার নেই, আছে শুধু ছড়ার, একটা নকল চাবি অথবা
ডিনামাইট ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ এই দীর্ঘ ছুটি বছর জুড়ে মাথা নিচু
করে এইসব ভেবেছি এর মধ্যেই আমার সন্তান হয়, এর মধ্যেই আমার
ইনক্রিমেন্ট হয়, এর মধ্যেই আমি ভয়ে আর রাগে আর দুঃখে আর
প্রতিহিংসায় একটু করে ক্ষয়ে যেতে থাকি।"[১৭]

(দেরি হয়ে যাচ্ছে / মানুষের মূর্তি)

ভানহীন ও সত্যপরায়ণ বলেই দেবদাস নিজের কথা বলতে গিয়ে এই স্তিমিত কটি পঙক্তিতে সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার মধ্যে আমাদের বিবেকদংশিত, সংসারী, একশো ভাগ মধ্যবিত্তের জড় দিনযাপনের কথা বলতে পেরেছেন। 'টেনশন' কবিতাতেও খেদ ও আক্ষেপ ভরা আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের বাসনা ও অবদমিত বিদ্রোহ মনস্তাত্তিক লাফ দেয়।

চতুর্থ বই 'ঠুঁটো জগন্নাথ' কবিতার বইটি (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৩) তিনটি ভাগে বিভক্ত; 'রিপু', 'জাতকের কথা' এবং '১৯৮২'। 'রিপু' সিরিজের কবিতাগুলিতে এক অকপট আত্মবিবৃতি এবং স্বীকারোক্তির প্রকাশ শোনা যায়। যেমন 'রিপু' কবিতায় কবি বলেন—

"...আমি নিজেই নিজের প্রভু, শিক্ষক
নিজেকে ভীষণ ভালোবাসি আমি
এই বোধ
পৃথিবীর হাওয়ায়, ধূলোয়, বাষ্পে কিছুদিন রেখে যেতে চাই।"[১৮]

(রিপু / ফুঁটো জগন্নাথ)

কারণ তিনি হিংসা ও হত্যা নয় ভালবাসার শক্তিকে বড় করে দেখেছেন, টের পেয়েছেন, তাই তো তিনি বলেছেন—

"... আমাদের শ্রেষ্ঠতম শিল্পগুলির নাম ভালোবাসা
আমাদের মহৎ কবিতাগুলি প্রকৃতই
হৃদয় থেকে ছড়িয়ে পড়া আলো।"[১৯]

(আলো / ঠুটো জগন্নাথ)

'জাতকের কথা' সিরিজের কবিতা জুড়ে সংসার জীবন, শিশু, স্ত্রীর কথা প্রবলভাবে উঠে এসেছে। সুদূর ভাবীকালের সন্ততিদের সঙ্গে আমাদের যে কত স্নেহের, আদরের, মধুর বন্ধন থেকে যেতে পারে বৃদ্ধ প্রপিতামহ দেবদাস 'জাতকের কথা' কবিতায় তা বর্ণনা করেছেন। 'আত্মজীবনচরিত' এ মধ্যবয়স্ক বাঙালি কেরাণীর সংকটের কথা বলেছেন। শহরের প্রান্তে, বস্তিতে যার আছে এক কুঁড়েঘর, দুটি শিশু, একটি স্ত্রীলোক ও আত্মীয়-স্বজন। 'গণদেবতার কাছে প্রার্থনা' কবিতায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর মতো সন্তানের ভালো কামনার কথা শোনা যায় —

"বয়স তো চল্লিশ হলো
কোন মৌল আকর্ষণ আর নেই
একটি স্ত্রীলোক পেয়েছি, আর দুটি শিশু...
আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু
আমার সন্তানের জীবন আর
একটু সুন্দর হোক, শোনো
হে গণদেবতা
আমার প্রার্থনা তুমি রেখো।"[২০]

(গণদেবতার কাছে প্রার্থনা / পুঁটো জগন্নাথ)

বংশধারা রেখে যাবার দুর্মর ইচ্ছায় কবি দেবদাস নিজের অস্তিত্বকে দেখতে পান বৃক্ষের অনুরূপ সত্তায়। 'উদ্ভিদ' কবিতায় তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সংসার সমাজচিন্তার সঙ্গে দেবদাস আচার্য চিরদিন দৈনন্দিনের সঙ্গে শাশ্বত, বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের মেলবন্ধন ঘটিয়ে চলেন। তিনি তাই বলতে পারেন—

"জলের প্রাণীরা জলে থাকে
ডাঙার প্রাণীরা থাকে ডাঙায়
শুধু স্বপ্নের প্রাণীরা কষ্ট পায়।"[২১]

(কবি / পুঁটো জগন্নাথ)

যাই হোক এই ভাবে স্ত্রী আর দুই পুত্রকে নিয়ে চমৎকার এক সামন্ত শহর। যেখানে প্রাচীন নারিকেল গাছ, ইটের পুরু প্রাচীর, নোংরা পয়ঃপ্রণালী, এঁদো অন্ধকার গলিখুঁজি, গলির মোড়ে মোড়ে ছেলেরা রেডিও কানে ধরে গুলতানি মারে — সেখানে দেবদাসের অনেকদিন কেটে গেল। দেবদাস নিজেই নিজেকে সম্বোধন করে বলেন—

'হ্যালো, মাস্টার
১৯৮২ সালও চলে গেল!'

পরবর্তী বই 'উৎসবীজ' যার প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। তাতে দেখা যায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রেই দেবদাস তার সৃষ্টির পরিধিকে লক্ষণীয়ভাবে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। 'উৎসবীজ' দীর্ঘ কবিতায় কবি মহাজাগতিক উৎস থেকে উপাদান আহরণ করে জাগতিক সৃষ্টি তত্ত্বের আবিষ্ট বন্দনা করেছেন। এই কবিতার নিসর্গ মাধুরী, কারখানা, খামার, বন্দরে, পোতাশ্রয়, সর্বত্র শ্রমের মোহনীয় রূপের কথা আমাদের এক সমুন্নত বিস্ময়ে স্পন্দিত করে তোলে।

'উৎসবীজ' এর পাশাপাশি **১৯৯২** জানুয়ারি কলকাতা বইমেলা প্রকাশিত হয় আর এক আশ্চর্য গ্রন্থ 'আচার্যর ভদ্রাসন'। বিশ শতকের শেষ লগ্নের লৌকিক বাংলায় এসে পড়ল হাজার বছর আগের জাতিস্মর আলো। চর্যাপদের জগৎ যেন নতুন বয়ান পেল কবির কলমে। কবি লেখেন—

"নগরের প্রান্তে সিদ্ধাচার্যের বাড়ি
খুড়িয়া নদীর কূলে বাগদিপাড়া, বেদেদের তাঁবু
হাওয়ার গম্ভীর আকাশের দিকে ভেসে যায়...
এত প্রসারতা, এত উন্মুক্ত আকাশ...
দূরে শ্মশানের আলো
শ্রী আচার্যের অস্তিত্ব চেটে চেটে খাই ওই বাড়ি, ওই অতিপ্রাকৃতিক।"[২২]

(আচার্যের ভদ্রাসন)

কাছাকাছি মেয়েদের হোস্টেল, ইটভাটার চিমনির ধোঁয়া, সেচ যন্ত্রের শব্দ, গাভীর হাম্বা রব, পানকৌড়ির ডুব, স্নানরতা মেয়েদের সাবান মাখা—হাওয়া যেন এদের নিয়ে মূর্তি গড়েছে এবং ভেঙেও দিচ্ছে। ঐখানে ইচ্ছা বৃক্ষমূলে বসে সিদ্ধাচার্য চর্যা গান গাই। প্রথমদিকে যার ব্রাত্য হতে আপত্তি ছিল তিনি নিজেই নিজেকে এক ব্রাত্য ঈশ্বরের কৃপাহীন নাগরিক বলেছেন। শূন্য অনুবাদ করেন তিনি। নিজেকে ডোম, স্ত্রীকে ডোমনী বলেন, কখনো কখনো চর্যাগীতির ঘরানায় যেমন নিজেকে সিদ্ধাচার্য বলেন, তেমন গৃহিণীকে বলেন নৈরাত্মমণি, নৈরামণি—

"সিদ্ধাচার্য হাট করে ফেরেন।
পুঁটলিতে শূকর মাংস
নৈরাত্মমণি রাঁধবেন।
নৈরাত্মমণি পাক শবর গ্রামের বড় প্রিয়
আজ ভোজ, জাতীয় সড়কে বাজে দুন্দুভি
শবর গ্রামের উৎসব
পাশমুক্ত হবেন কি সিদ্ধাচার্য আজ?"[২৩]

(সহবাস / আচার্যের ভদ্রাসন)

সন্ধ্যের পর জায়গাটা আরও বদলে যায় 'সিদ্ধাচার্য মগ্ন হন গূঢ়লোকে মানসভ্রমণে'। এই সময় সিদ্ধাচার্য ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী, তাঁর তৃতীয় নয়ন অশ্রুতে ভেসে যায়। এই সময় সিদ্ধাচার্যের সঙ্গে ডোমনীও গান ধরে, গান করে রাতের খেচর, গান গায় নদী, ক্ষেত, জ্যোৎস্না, হিম, গান গেয়ে ওঠে শ্মশান কুকুর। দেবদাস আচার্য টের পেয়েছিলেন তিনি ধীরে ধীরে চিরকালীনতার দিকে যাচ্ছেন। নিজের এই অবস্থাটা ধরে দেবার জন্য সোজাসুজি চর্যাগীতির সিদ্ধাচার্যদের জীবনযাপনের লাইনে নিজের জীবনকে ভাবতে চেয়েছেন। বস্তুত নতুন বাড়ি এবং মধ্যবয়স যেন কবিকে এক স্থিতি এনে দিয়েছিল। যার কারণে তাঁর মন পাড়ি দিয়েছে গভীর পথে, ভাবের পথে। 'অ্যাকাউন্টবাবু' নামক কবিতায় দেহ ও আত্মার নতুন অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন কবি—

"...দশটা পাঁচটা অ্যাকাউন্টবাবু
কর্জ করে তেল আনেন মুদিখানা থেকে
এ জীবন, হায়, কাটবে কি চোখের জলে?
গরলবর্ণ দেহ, সিদ্ধাচার্য, ক্ষারে ভেজা রিপু
অঝরে কাঁদেন।"[২৪]

(অ্যাকাউন্টবাবু / আচার্যের ভদ্রাসন)

এই আত্মানুসন্ধানের আর্তি ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে দেবদাসের গহন মর্মলোকে। ঘটনাবর্তে বেদনার অভিঘাত এসে লাগে কবির জীবনে। যার প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয় 'তর্পণ' কাব্যগ্রন্থটি (১৯৯৪)। 'জীবনের অতিরিক্ত যে জীবন তার স্পর্শ এসে লাগে কবির পৃষ্ঠায়। কবির নির্মোহ শ্রুতিতে বেজে উঠে এক গভীরতর চিরধ্বনি—

"পৃথিবীর হৃদয় পার্থিব

শোক, তাপ, সুর ও সৌন্দর্যময়
কিন্তু একদিন
সর্বভুক অমরত্ব এসে গ্রাস করে নেবে এ মরজীবন।"
(মৃত্যু /তর্পণ)

দেবদাসের 'নির্বাচিত কবিতা থেকে অগ্রন্থিত কবিতা' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭) কিছু কবিতা রয়েছে। যার মধ্যে 'কথকতা', 'গাঁয়ের ইতিহাস', 'পুষ্টি' এই কবিতাগুলিতে গ্রাম জীবনের আবহ, ঘ্রাণ, সংস্কার মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন 'পুষ্টি' কবিতাটি—

"যখন আমি রুটি খাই, তখন...
রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরে ভাবি
আমার শরীর অসংখ্য গমের দানা দিয়ে তৈরি একটা গমের শীষ
প্রতিটি দানার মধ্যে বেজে ওঠে
এই উপমহাদেশের লোকাচার, কিংবদন্তী, স্বপ্ন ও সঙ্গীত আর
শিষের-ডগায় ঝরে পড়ে ভারতীয় শিশির ও সূর্যোদয়।"
(পুষ্টি / নির্বাচিত কবিতা)

'অহম', 'ওঁ বস্তু, এ শরীর ও আত্মা' এই দুই কবিতাতে ফুটে উঠেছে আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিবৃতির 'অহম', স্বর। 'বেঞ্জামিন মোলায়েজ বলেন' কবিতায় ফাঁসির দড়ি গলায় পড়া কালো মোলায়েজের মুখ দিয়ে দেবদাস শিল্পের চেয়ে জীবনকে গরীয়ান করেছেন- "খাদ্য আর আত্মরক্ষা কবিতায় চেয়ে বেশি জরুরি / আমাদের বেঁচে থাকার শিল্প এখান থেকেই শুরু হয়েছে"।[২৭] বলেছেন সঙ্ঘবদ্ধ একাত্মতা অর্থাৎ মানবতার কথা। এইভাবে কবি 'সুভাষিতম', 'রসাতল থেকে ফিরে', 'যে আছো অন্তরে' থেকে অজস্র অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে দিয়ে দেবদাস মাটির সঙ্গে রক্তকে জীবনের সঙ্গে শস্যকে একাকার করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি খুঁজেছেন জীবনের প্রকৃত রূপ।

ভাগ্যের ফেরে জীবনের অনেক বেদনাময়, অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার হলাহল পান করতে হয়েছে দেবদাসকে। তাঁর মনে ঘন হয়েছে অসহায়তা, একাকীত্ব, গাঢ় বিষাদ। তারই মধ্যে ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিবাদের স্পৃহা তাকে আলোড়িত করেছে। পরিবার, সমাজ, দেশ, কাল, মানুষ, জীবন—পরজীবন, ইতিহাস, বিজ্ঞানচেতনা—সবকিছুর মধ্যে দিয়ে তাঁর কবিতা বিচরণ করেছেন কিন্তু—দেবদাস কখনো মাটির বন্ধন ছিন্ন করেননি, অস্বীকার করেননি শিকড়কে।

"আঁশে, কোষে, বাকলের অভ্যন্তরে ধরে আছি
পৃথিবীর পারদ ও জল
কখন যে শিকড়ের সঙ্গে ঢুকে গেছি মাটির আত্মায়।"

এই তাঁর কবিতার আসল সুর— এখানেই আধুনিক বাংলা কবিতায় দেবদাস আচার্য চিরন্তন হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রেষ্ঠ কবিতা দেবদাস আচার্য, সম্পাদনা গৌতম বসু, প্রকাশক আদম, পৃ. ২৩১
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ১২
৪. তদেব, পৃ. ১৭–১৮
৫. তদেব, পৃ. ২০-২১
৬. তদেব, পৃ. ২৪
৭. তদেব, পৃ. ২৬
৮. তদেব, পৃ. ২৮
৯. তদেব, পৃ. ৩০
১০. তদেব, পৃ. ৫২

১১. দ্রাক্ষাপুঞ্জ, শুঁড়ি ও মাতাল, মনীন্দ্র গুপ্ত, অববাস প্রকাশন, পৃ. ১৩৫

১২. তদেব, পৃ. ৫৬

১৩. তদেব, পৃ. ৫৪

১৪. দেবদাসের জীবন প্রভাত, দেবদাস আচার্য, অববাস প্রকাশন পৃ. ৩৪

১৫. তদেব, পৃ.- ৫৫

১৬. দেবদাসের জীবন প্রভাত, দেবদাস আচার্য, অববাস প্রকাশন পৃ. ১১

১৭. শ্রেষ্ঠ কবিতা দেবদাস আচার্য, সম্পাদনা গৌতম বসু , প্রকাশক আদম, পৃ. ৬২

১৮. তদেব, পৃ. ৮৮

১৯. তদেব, পৃ. ৮৮

২০. তদেব, পৃ. ৮৮

২১. তদেব, পৃ. ৮৫

২২. তদেব, পৃ. ১০৪

২২. তদেব, পৃ. ১১১

২৩. তদেব, পৃ. ১১৯

২৪. তদেব, পৃ. ১২২